দুই নারী
এক জীবন

বিনোদ ঘোষাল

অরণ্যমন প্রকাশনী

দরজা ঠেলে 'বাহার' বারের ভেতর ঢুকে পড়ল তৃষা। বাইরে মে মাসের দুপুরের রোদ কলকাতার রাস্তাঘাটে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদিও তৃষাকে এই গনগনে আঁচ ছুঁতে পারল না। গাড়ি থেকে নেমেই বারটায় ঢুকে পড়ল। কলামন্দির আর মল্লিকবাজার— এই দুই বাস-স্টপেজের মাঝে এজেসি বোস রোডে শতাব্দপ্রাচীন এই বারটি নেহাতই চাকচিক্যহীন। পালিশ করা বার্মাটিকের ভারী দরজাটি ঠেলে দেওয়ার জন্য বাইরে কোনো সিকিউরিটি গার্ড এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। কাস্টমারকেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়। ভেতরে ঢোকামাত্রই নাকে ধাক্কা দেয় বহু পুরোনো একটি সোঁদা গন্ধ। পুরোনো মদ আর ঐতিহ্য মেশানো এই গন্ধটি এই বাহার বারের রেগুলার কাস্টমারদের বড়ো প্রিয়। তাঁরা এই গন্ধে একাত্মবোধ করেন। এই বারে যাঁরা আসা-যাওয়া করেন তাঁরা পরস্পরের মুখ তো চেনেনই, অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও রয়েছে। আসলে এই বারে তরুণ প্রজন্মের তেমন কেউ আসে না। কারণ, বারটি সাজসজ্জায় নেহাতই চাকচিক্যহীন। শেষ কবে এর ইন্টেরিয়র রিভ্যাম্প করা হয়েছিল তার হদিশ কেউ জানে না। হয়তো এই চিরপরিচিত রূপটিই এখানকার কাস্টমারদের আরাম দেয় বলে ইচ্ছে করেই এর আন্তরিক রূপটি বদলের কোনো চেষ্টা হয়নি। খান পঁচিশেক গদি-আঁটা কাঠের চেয়ার এবং চকচকে টেবিলগুলিও বহুপ্রাচীন। কয়েকটি হলদেটে আলো জ্বলে, যা কিছুটা আলো-আঁধারির পরিবেশ তৈরি করে। মাত্র তিনজন ওয়েটার, তারা তিনজনেই এই বারের বহু পুরোনো কর্মচারী এবং কাউন্টারে বসেন এক শীর্ণকায়া মহিলা, সত্তরোর্ধ্ব এই মহিলার নাম ফৈরুজা, যার মানে হল 'বিজয়িনী'। ফৈরুজা'র হাজব্যান্ড আরমান ছিলেন এই বারের মালিক। বছর পনেরো আগে এক সন্ধেবেলায় আরমান তাঁর বাহার চালাচ্ছিলেন, আচমকাই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে এখানেই লুটিয়ে পড়েন। হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ারও সুযোগ মেলেনি। লি রোডের বাসিন্দা এই নিঃসন্তান পারসি দম্পতি ছিলেন একে অপরের আশ্রয়। দীর্ঘকালের দাম্পত্য তাঁদের ভালোবাসাকে নিছক দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি। ফলে আরমান চলে যাওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন ফৈরুজা। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকল বাহার। পুরোনো কাস্টমাররা ভাবলেন বার বুঝি এবার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাহার আবার খুলল। আরমানের বড়ো প্রিয় এই বার, নিজে নাম রেখেছিলেন 'বাহার', যার মানে বসন্ত ঋতু। ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত মানুষ এখানে যেন দু'দণ্ড বসে একটু শান্তি পায়,

এ-ই ছিল তার মূল ইচ্ছে। তাই কোনোকালেই তিনি চাননি তাঁর বাহার অতি আধুনিক, ঝকঝকে হয়ে উঠে অতিথির অন্তরের শান্তি নষ্ট করুক। চিরকাল ঘর-সংসার সামালানো ফৈরুজা শুধুমাত্র আরমানের এই স্বপ্নটুকু যেন শেষ না হয়ে যায় সেই কারণেই কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই একদিন এসে বসেছিলেন ক্যাশ কাউন্টারে। তাঁকে সাহায্য করেছিল বারের পুরোনো ওয়েটাররা। আবার ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করল পুরোনো কাস্টমাররা। বাহার ফিরে এল তার পুরোনো স্বাভাবিক ছন্দে।

এই বারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পারসি গজল। সাউন্ড সিস্টেমে খুব লো ভল্যুমে এখানে অচেনা গায়কের কণ্ঠে অবিরাম চলতে থাকে গজল। তৃষা প্রথমবার যেদিন আচমকাই ঢুকে পড়েছিল এই বারটিতে, সেদিন বাইরে হচ্ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। বাইরেও, অন্তরেও। তীব্র অস্থিরতা ছিল শরীরজুড়ে। টিচার্সের দুটো লার্জ পেগের সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক সময় অনেকটাই প্রশমিত করেছিল তৃষার উত্তেজনা। শুধু প্রশমনই নয়, এই বারের নির্জনতা, সঙ্গে ওই অজানা ভাষার মৃদু গজলের সুর তৃষার সদ্যসৃষ্ট ক্ষতটির গায়ে যেন বুলিয়ে দিয়েছিল এক আশ্চর্য ওষধি। এই বারে একটি গ্লাস নিয়ে চুপ করে বসে থাকলেও কেউ এসে তাড়া দেবে না, ওয়েটার কিছুক্ষণ পর পর এসে জিজ্ঞাসা করবে না 'আর কিছু অর্ডার করবেন? তাহলে বিল করব?'

অনেকটাই স্থির হওয়ার পর বিল মিটিয়ে চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল তৃষা। এগিয়ে গিয়েছিল ক্যাশ কাউন্টারের দিকে। ফৈরুজা হাসিমুখে ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিছু বলবেন, ম্যাডাম?"

"আমি কি জানতে পারি এটা কী গান বাজছে?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, পারসি গজল।"

"বাহ্, ভারি অদ্ভুত সুর তো!"

উত্তরে স্মিত হেসে ফৈরুজা বলেছিলেন, "আবার আসবেন, ম্যাডাম।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

তারপর থেকে বহুবার এই বারে এসেছে তৃষা। যখনই মনে হয়েছে মন আজ অতিরিক্ত অস্থির তখনই চলে এসেছে এখানে। কখনও শান্তি মিলেছে, কখনও মেলেনি, কিন্তু সুযোগ পেলেই এসেছে। একা কাটিয়ে গিয়েছে বেশ কিছুটা সময়।

বারের মূল দরজা ঠেলে ঢুকলেই মুখোমুখি একটি পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের আয়নার মুখোমুখি হতে হয় সকলকে। নিজেকে আপাদমস্তক একঝলক দেখে নিয়ে শাড়ির আঁচলটা সামান্য ঠিক করে নিয়ে বাঁ দিকের একেবারে

কোণের টেবিলটির দিকে এগিয়ে গেল তৃষা। ওই টেবিলটি তৃষার খুব প্রিয়। মাত্র দুটি মুখোমুখি চেয়ার আর ছোটো একটি টেবিল। একেবারে কোণের দিক, ফলে কারও খুব একটা নজর যায় না। এমনিতেই এই বারে ভিড় হয়ই না, তাই বেশিরভাগ সময় ওই টেবিল ফাঁকাই থাকে। তৃষা ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ফৈরুজার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ফৈরুজা মৃদু হাসলেন। এই মহিলার হাসিটি আন্তরিক। কিছু মানুষ পৃথিবীতে রয়েছেন যাঁরা কোনোকালেই প্রফেশনাল হাসি হাসতে পারেন না। হাসির মধ্যেই সেই সহজ আন্তরিকতা বোঝা যায়। তৃষার আজ হাসি আসছিল না, তবু ভদ্রতার খাতিরে সামান্য হাসির মতো ঠোঁট প্রসারিত করে কাউন্টার পার করে গিয়ে বসল টেবিলে। দামি ব্র্যান্ডের হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওয়েট টিস্যুর প্যাকেট থেকে একটা সুগন্ধি টিস্যু বার করে মুখের সর্বত্র আলতোভাবে স্পর্শ করল। মৃদু চন্দনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ওকে ঘিরে। আজ নিজের গাড়িতে না গিয়ে ওলা বা উবের নিয়ে নিলে বেস্ট হত। উফ্‌ফ্‌, চোখমুখ যেন জ্বলছে! মে মাসের দুপুরের দাহ সহ্য করার ক্ষমতা তৃষার নেই। ওর গাড়ির এসিটা গতকাল খারাপ হয়েছে। ড্রাইভার ইসমাইলকে কালই বলেছিল এসিটা গ্যারেজে গিয়ে সারিয়ে ফেলতে। ছেলেটা এমন কুঁড়ে, যায়নি। আজ তার জন্য বেজায় ধমক খেয়েছে তৃষার কাছে। আজ বাড়ি ফেরার পর ইসমাইল গাড়ি নিয়ে যাবে গ্যারেজে। এসি সারিয়ে তারপর ওর ছুটি।

বারের এসির ঠান্ডা হাওয়া আর স্পিরিট মেশানো টিস্যুর শীতলতা তৃষার তপ্ত মুখমণ্ডলকে কিছুটা শান্তি দিল। তৃষা আবার ব্যাগ থেকে ওর ছোটো আয়না আর চিরুনি বার করল। চিরুনিটি চন্দনকাঠের এবং আয়নাটির ফ্রেমও চন্দনকাঠের তৈরি। আসলে চন্দনের প্রতি তৃষার তীব্র আসক্তি। সেই ছোটোবেলা থেকেই। এই গন্ধে বরাবর তৃষার নেশা ধরে যায়। মাতাল-মাতাল লাগে। ওর পারফিউম, ডিও, বডিসোপ থেকে আরও যা যা প্রসাধনী— সবই চন্দনগন্ধি। ফ্ল্যাটে রুম ফ্রেশনার কিংবা টয়লেটের এয়ার ফ্রেশনার থেকে ধূপকাঠি— সবই চন্দনসুরভিত। আয়না মুখের সামনে ধরে চিরুনি দিয়ে নিজের চুল সামান্য ঠিক করে নিল তৃষা। গাড়িতে এসি না চলার কারণে গাড়ির একটা কাচ নামানো ছিল, ফলে সেখান দিয়ে কলকাতার ধুলোমাখা লু এসে তৃষার চুল বেশ কিছুটা এলোমেলো করে দিয়েছে। চুল আঁচড়াতে গিয়ে তৃষা নজর করল ওর পাটকিলে রঙের ডাই করা চুলের বেশ কিছুর গোড়া থেকে সাদা রং ঝিলিক দিচ্ছে। ইস্‌স্‌, পাকা চুল দেখা যাচ্ছে! আজই বাড়ি ফিরে আবার ডাই করাতে হবে। কোনো এককালে তৃষার চুল ছিল কোমর-ছাপানো। দেখে মনে হত একটি দাঁড়াশ

সাপ পিঠ বেয়ে নেমে গুরুনিতম্বের মাঝামাঝি ফণা তুলে থেমে রয়েছে। হাঁটলে সেই সাপও চলতে থাকত মৃদুমন্দ ছন্দে। এসব কতযুগ আগের কথা যেন। তারপর... তারপর অনেক কিছু ঘটে গেল।

মনোজ এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। এই বারের ওয়েটার, বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। অনেক পুরোনো কর্মচারী। পরনে খয়েরি ইউনিফর্ম, মাথার টুপিটিও খয়েরি। মৃদু হেসে বলল, "গুড আফটারনুন, ম্যাম।"

তৃষা উত্তরে শুধু সামান্য হাসল। কিছু বলল না।

"ম্যাম, নর্মাল ওয়াটার দেব না কি চিলড?"

"নর্মাল।"

"আচ্ছা।" চলে গেল মনোজ। এই বারে এলে মনোজই সার্ভ করে তৃষাকে। টিচার্সের দুটো লার্জ পেগ। দুটি পেগ সার্ভের মাঝে ঠিক চল্লিশ মিনিটের ব্যবধান। মনোজ কখনও ভাবে, এই ম্যাডাম প্রতিমাসে দুই থেকে তিনদিন আসেন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, কিন্তু প্রতিবারই একা আসেন এবং কখনই দুটোর বেশি ড্রিংক নেন না, আর সঙ্গে ফ্রুটস। সল্টেড কাজু বা ডালমুট কিছু নয়।

তৃষা বারের চারপাশে চোখ বোলাল। আজ বার একেবারে খালি নয়। বরং বেশ লোকজন রয়েছে। তীব্র গরমের কারণে টেবিলে টেবিলে চিলড বিয়ারের বোতলই বেশি। সবক'টা চেয়ার ভরতি না হলেও টেবিল কোনোটাই ফাঁকা নেই।

আজ তৃষার মন ভীষণ অস্থির। বাড়ি ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। পাকুর সঙ্গে খুব অশান্তি হয়েছে। আজ আবার কুড়ি হাজার টাকা চেয়ে ফোন করেছিল পাকু। দিতে অস্বীকার করেছিল তৃষা। ব্যস! তার পরেই লেগে গেল মা আর মেয়েতে অশান্তি। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করল পাকু তৃষাকে। যেমন কুৎসিত ভাষা তেমনই তার ভয়ংকর চিৎকার। ফোন কানের থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও চারদিকে সেই চিৎকার ছড়িয়ে যাছিল। তৃষার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং মোলায়েম। ফলে প্রতিবারের মতো এবারেও সে মেয়েকে প্রায় কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারেনি। চুপ করে শুনে গিয়ছে। পাকু ফোনটা কাটার আগে হুমকি দিয়েছে, "কালকের মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করে দেবে বলে দিলাম, নাহলে খুব খারাপ হবে।"

এই 'খুব খারাপ হবে' লাইনটাতেই কেঁপে উঠেছিল তৃষা। এই একুশ বছর বয়েসের মধ্যে তিনবার খুব খারাপ করার চেষ্টাই করেছিল পাকু। খুব খারাপ। তারপর থেকেই তৃষা চেষ্টা করে মেয়ের মন জুগিয়ে চলার। এক-এক সময় ভয়ংকর রাগ হয়, হতাশ লাগে। এক-এক সময় মনে হয় এইভাবে মেয়ের মন জুগিয়ে চলার কোনো মানে হয় না। পাকু এখন ঠিক

একুশ বছর তিন মাস। সে যদি নিজের লাইফস্টাইল নিজে ঠিক করতে না পারে তাহলে এইভাবে মা'কে ব্ল্যাকমেল করে টাকা চাওয়ার অধিকারও তার নেই। টাকা দেবে না ভাবে তৃষা। যা করে করুক। তারপরেই ধীরে ধীরে এক অপরাধবোধ, ভয় ওকে গ্রাস করতে শুরু করে। মেয়ের কথা শেষপর্যন্ত না শুনে আর থাকতে পারে না।

মনোজ এসে কাচের গ্লাসে জল রাখল। তৃষা সঙ্গে সঙ্গে কয়েক চুমুকে পুরো জলটা শেষ করল। আহ্! অনেকটা আরাম লাগছে।

মনোজ ওর কাচের জাগ থেকে আবার গ্লাসে জল ভরে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি সার্ভ করব, ম্যাম?"

"প্লিজ... "

"আচ্ছা।" মনোজ চলে গেল তৃষার ড্রিংক রেডি করতে।

মোবাইলে টিং করে শব্দ হল। মেসেজ এসেছে। আসুক। এখন দেখতে ইচ্ছে করছে না। চুপ করে বসে রইল তৃষা। নিশ্চয়ই অনির্বাণ মেসেজ করেছে। অসহ্য! মেসেজের রিপ্লাই না পেলেই কল করবে। এখন জগতে কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে সুইচড অফ করে দিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখার সময় চোখ পড়ল মেন দরজার দিকে। এক মহিলা ঢুকেছেন। বেঢপ মোটা। পুরো গোল মুখ, তার থেকেও বেশি যেটা নজরে পড়ার তা হল পরনের ছাপা শাড়িটি একেবারেই আটপৌরে, অতি ব্যবহারের ফলে অনেকটাই বিবর্ণ। আর কাঁধের শান্তিনিকেতনি ঝোলাটিও তথৈবচ। মেয়েটি ভেতরে ঢুকে তার গোলগোল চোখ চারিধারে বোলাতে থাকল। তৃষা বুঝতে পারল মহিলা ভুল করে এখানে ঢুকে পড়েছে। এখনই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু না, মেয়েটি সব টেবিলগুলো খেয়াল করে দিব্বি গটগটিয়ে তৃষার সামনে এল।

"এক্সকিউজ মি, আমি কি এখানে বসতে পারি?" তৃষার মুখোমুখি চেয়ারটির দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

তৃষা বেশ হকচকিয়ে গেল মেয়েটির এমন প্রশ্নে। স্রেফ হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি আবার বলল, "আমি কি এখানে বসতে পারি? চেয়ারটা কি খালি রয়েছে?"

"বসুন।" মনে মনে বেশ বিরক্ত হল তৃষা। আজ একাকিত্ব প্রয়োজন ছিল। সে তো জুটলই না, উপরন্তু জুটল সাক্ষাৎ বিরক্তি! আর একজন ওয়েটার এগিয়ে এল মেয়েটির দিকে।

"আগে এক গেলাস জল দিন না, দাদা।" শাড়ির আঁচল দিয়ে গোটা মুখে জমে ওঠা ঘাম মুছতে মুছতে বলে উঠল মেয়েটি।

তৃষা মেয়েটির উপস্থিতিকে উপেক্ষা করবে ভেবেও আবার তাকিয়ে ফেলল। শ্যামবর্ণা মেয়েটির শরীরে একটিও অলংকার নেই। শুধু একটি ঘড়ি।

মুখ মোছার পর ওই আঁচলেই চওড়া গলার ভাঁজে জমে থাকা ঘামটুকুও মুছে নিল ভালো করে। ঘাম মোছার জন্য মেয়েটি যখন তার ভারী মাংসল ডানহাতটি তুলল, তৃষা খেয়াল করল বগলের ঘামে ব্লাউজ গোল হয়ে ভিজে রয়েছে।

আবারও তীব্র বিরক্তিতে ভরে উঠল তৃষার মন। এই বার আকারে ছোটো হলেও যথেষ্ট বনেদি এবং ড্রিংকসের পেগ যথেষ্টই খরচসাপেক্ষ। মেয়েটি কি এসব জানে? হয়তো না। সবথেকে বড়ো কথা, এই মেয়েটি এই বারে মানানসই নয়। অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

তৃষা ভাবল উঠে চলে যাবে। এই জলহস্তীর সামনে বসে পান করার কোনো মানে হয় না। মেজাজ ঠিক তো হবেই না, উলটে আরও বিগড়ে যাবে। কিন্তু ড্রিংকের অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আজ একটা পেগ নিয়েই উঠে পড়তে হবে।

তৃষা দেখল মনোজ ট্রে হাতে এদিকেই আসছে। সামনে এসে ট্রে থেকে প্রথমে কাচের গ্লাস নামাল মনোজ, তারপর কাচের ছোটো জার থেকে মেপে আনা টিচার্সের র পেগ ঢেলে দিল। তারপর আইস কিউবের পট, মিনারেল ওয়াটার এবং ফ্রুট সালাডের ডিশ সাজিয়ে দিল সামনে।

মেয়েটি তাকিয়ে রয়েছে তৃষার এইসব সরঞ্জামের দিকে। অসহ্য!

"দাদা, আমার অর্ডারটা নেবেন?" বলে উঠল মেয়েটা।

কথার ধরন শুনেই বোঝা যায় এই ধরনের বারে আসার অভিজ্ঞতা নেই। যেন পাড়ার কচুরি-শিঙাড়ার দোকানে অর্ডার দিচ্ছে!

"হ্যাঁ ম্যাম, বলুন।"

"স্ট্রং বিয়ার যা রয়েছে দিন। ঠান্ডা হবে তো ভালো?"

"হ্যাঁ, হবে। আর বলুন?"

"আর... উঁ আর কী নেওয়া যায়... " বলতে বলতে টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা দিল মেয়েটা। তারপর বলল, "অমলেট হবে?"

"হ্যাঁ, হবে।"

"তাহলে জমিয়ে একটা অমলেট বানিয়ে দিন, ব্যস!"

"আচ্ছা, ম্যাম।" অর্ডার নিয়ে চলে গেল মনোজ।

তৃষা প্লেট থেকে এক টুকরো আপেল তুলে মুখে দিল। অন্যদিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করল। আজ এখানে না এলেই ভালো হত। দিনটাই পুরো খারাপ।

"আজ খুব গরম, তাই না?" মেয়েটা একগাল হেসে বলল তৃষাকে।

"হুঁ," সংক্ষেপে উত্তর দিল তৃষা।

"কলকাতার দিকে গরমটা বেশি। আমাদের দিকে এতটাও নয়।"

"আচ্ছা।" 'আমাদের দিক' মানে কোনদিক সেটা জানার কোনো আগ্রহ নেই তৃষার। কিন্তু এই মেয়ে যে জ্বালিয়ে খাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

"আমি আসলে উলুবেড়িয়ায় থাকি। স্টেশন থেকেও অনেকটা ভেতরে। অনেক গাছগাছালি রয়েছে তো।"

এবারের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের ড্রিংক বানাল তৃষা। তারপর একটা আইস কিউব দিয়ে ছোটো সিপ দিল। 'মেয়েটার আর কোনো কথারই উত্তর দেব না', মনে মনে সংকল্প করল, 'বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার সঙ্গে ডিসকাশনে যাওয়ার কোনো আগ্রহ নেই আমার।'

"এই মল্লিকবাজারে যে নিউরো হসপিটালটা আছে না, ওখানে এসেছিলাম... বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম অরণ্যা। আপনার নাম?"

"তৃষা সেন।"

"বাহ্, খুব সুন্দর নাম। আমার নামটাও সকলে বলে খুব ভালো।" বলে নিজেই হি হি করে হেসে উঠল মেয়েটি। তৃষা মেয়েটির হাসির দিকে তাকিয়ে দেখল দাঁতের সারি যেমন সুন্দর তেমনই হাসিটিও সহজ।

"আমি আসলে রুপু, মানে আমার ছেলে রূপের রিপোর্টগুলো নিতে এসেছিলাম হসপিটাল থেকে।"

এই কথা শোনার পর আর চুপ থাকতে পারল না তৃষা। জিজ্ঞাসা করে ফেলল, "আপনার ছেলে?"

"হ্যাঁ, ডাউন সিন্ড্রোম।" ক্যাজুয়ালি বলল অরণ্যা।

তৃষা কিন্তু তত সহজে নিতে পারল না, নিজের অজান্তেই মুখ থেকে অস্ফুটে 'ইস্স্' শব্দটা বেরিয়ে এল।

"না না, আহা করার কিছু নেই, রুপু এখন দিব্বি আছে। আমি তো সবাইকেই বলি ছেলের বিয়ে দিয়ে, নাতিপুতি দেখে তারপর আমার শান্তি হবে।" বলে আবার হেসে উঠল অরণ্যা।

তৃষা আবার তাকাল অরণ্যার দিকে। হাসিটি একই রকম অকৃপণ।

"কত বয়স আপনার রূপের?" প্রশ্নটা আর না করে থাকতে পারল না তৃষা।

"এই তো সাতে পড়ল।"

মনোজ এসে একটা বিয়ারের বোতল আর মাগ এনে রাখল। "সার্ভ করে দেব, ম্যাম?"

"হ্যাঁ, দিন না।" আঁচল দিয়ে আবার নিজের গোল মুখটা মুছল অরণ্যা। তারপর আঁচলটা বেশ করে গুছিয়ে বসল।

দেখে হাসি পেয়ে গেল তৃষার। খুব আঁটসাঁট বেধে তৈরি হচ্ছে বিয়ার খাবে বলে।

"সাত বছর পেরেছি যখন, সত্তর বছরও পারব।" নিজেকেই যেন কথাটা বলল অরণ্যা।

"ওর সমস্যাটা কী?"

তৃষার প্রশ্নে আবার হাসল অরণ্যা। বলল, "ওর বেসিক সমস্যা তো একটাই। এক্সট্রা একটা ক্রোমাজোম।"

"হুঁ", আবার গ্লাসে চুমুক দিল তৃষা। পাকুর কথা মনে পড়ল। মেয়েটা কী করছে এখন কে জানে।

"খুব অসুবিধা হয়, তাই না?" প্রশ্নটা করে ফেলে তৃষা ভাবল এমন প্রশ্ন না করাই উচিত ছিল।

অরণ্যা কিন্তু আবার হেসে বলল, "না না, প্রথমদিকে অসুবিধা হত, এখন মনে হয় ভাগ্যিস রুপু এমন। মায়ে-পোয়ে দিব্বি রয়েছি।"

'মায়ে-পোয়ে' কথাটা কানে বাজল তৃষার। তাহলে বাবা? ধুস্! এতসব ভাবার কোনো মানেই হয় না।

"আমি এদিকটা ঠিক চিনি না। রুপুকে যে ডাক্তার দেখেন উনি একটা টেস্ট দিয়েছিলেন তো, সেটারই রিপোর্ট নিতে এসেছিলাম। বেরিয়ে যা গরম লাগল ভাবলাম একটা কোল্ড ড্রিংক খাই। তারপর মনে হল অনেকদিন বিয়ার খাই না, একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম কাছাকাছি বার কোথায় রয়েছে, সে এইটার নাম বলল। ঢুকে পড়লাম। এক বোতল খেয়ে তারপর বাসে উঠব। রোদ্দুরটাও ততক্ষণে একটু নেমে যাবে।" একটানা কথাগুলো বলে গেল অরণ্যা। তারপর আবার হেসে ফেলে বলল, "আমি একটু বেশি কথা বলি।"

তৃষা হাসল। মেয়েটিকে একটু আগেও যতটা খারাপ আর বিরক্তিকর লাগছিল এখন ততটা লাগছে না।

"আপনার কি এখানে অফিস?"

"না না, আমার কলেজ অনেকটা দূরে। শোভাবাজারে।"

"আপনি কলেজে পড়ান? মানে প্রফেসর?"

"হুঁ। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর।"

"আরেব্বাস, দারুণ ব্যাপার!" অকারণেই খুশি হয়ে উঠল অরণ্যা। জিজ্ঞাসা করল, "আর আপনার বাড়ি?"

"গলফগ্রিনে।"

"সে তো এখান থেকে অনেক দূর। তাহলে এখানে কাজে এসেছিলেন বুঝি?"